লাইব্রেরী চাই

কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে লাইব্রেরীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যেই প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী থাকা অপরিহার্য। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি যদি কলেজ হয়, তো এই অপরিহার্যতা আরও বেশি প্রকট আকার ধারণ করে। দূর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা তথা উখিয়া ডিগ্রী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে একটি লাইব্রেরীর অভাবে ভোগে আসছি। বর্তমানে এই কলেজটি ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রায় দেড় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন। একটি লাইব্রেরীর অভাবে এখানকার শিক্ষার্থীরা শুধু যে প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারছেন না, তা নয়। বরং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বইয়ের অভাবে পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ কারণে এ কলেজে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। কিন্তু যেহেতু এটি একটি বেসরকারি কলেজ, সেহেতু একা কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা রাতারাতি একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যে সরকারের সুদৃষ্টি ও এলাকার দানশীল ব্যক্তিদের বদান্যতার ছোঁয়া বিশেষভাবে কাম্য।তাই, সরকার ও আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রতি আবেদন-উখিয়া ডিগ্রী কলেজে একটি লাইব্রেরী স্থাপনের জন্যে সহযোগিতা করুন।

(দৈনিক কর্ণফুলী, ২৩ মে, ১৯৯৮)

নগ্নতার কবলে সাংবাদিকতা

সাংবাদিকতা নিঃসন্দেহে একটি মহান পেশা। স্থানীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ ও সমাধান অন্বেষণের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ভূমিকা অগ্রপথিকের। এজন্যে পৃথিবীর সভ্য দেশসমূহে মত প্রকাশের স্বাধীনতা তথা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকরা দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু এ স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে দেশ ও জাতির বিরাট ক্ষতিও সাধিত হতে পারে। নৈতিকতা হয় নির্বাসিত, যুবসমাজে দেখা দেয় অপ্রতিরোধ্য স্খলন এবং বিভিন্ন অপরাধমুখী প্রবণতা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ সারা পৃথিবী জুড়ে তা-ই ঘটছে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। সরকারী হিসেব মতে শতাধিক দৈনিকসহ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক মিলিয়ে প্রায় পাঁচশ'র মতো প্রকাশনা রয়েছে এদেশে। অধিকাংশ দৈনিক বাদ দিয়ে বহুল প্রচারিত দৈনিক, সাপ্তাহিকীগুলোর কথা ধরলেও সমাজ জীবনে অপসাংবাদিকতার মারাত্বক প্রভাব উপলদ্ধি করা যায়। বিনোদনের নামে দৈনিকগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই নগ্নতা, যৌনতার ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। দেশী, বিদেশী নায়িকাদের নগ্ন ছবি, কুরুচিপূর্ণ জীবনাচার নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই ফিচার ছাপানো হচ্ছে এসব পত্রিকায়। এ প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর কথা বোধ হয় না বলাই উত্তম। ভেতরের উপজীব্য বিষয়গুলোর কথা ছেড়ে দিলেও শুধু প্রচ্ছদের কারণেই কোন ভদ্রসন্তানের পক্ষে পত্রিকা স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এসব দেখেশুনে আজ অনেকেই সাংবাদিকতার ভূমিকা সম্পর্কে কিঞ্চিত হলেও বিরূপ ধারণা পোষণ করছেন।

আগেই বলেছি, সাংবাদিকতা পেশাটি মহান। যে কোন মূল্যে এর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা দরকার। কিন্তু এ স্বাধীনতাকে আজ যেভাবে অপব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে সমাজ নিরাশ। এ অশুভ প্রবণতা রোধ করা দরকার। এজন্যে সাংবাদিক বন্ধুদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তবে এক্ষেত্রে পাঠক-পাঠিকার রুচির পরিবর্তনই আগে কাম্য। কারণ, পত্রিকা বাঁচে পাথক-পাঠিকার রুচির ও পকেটের উপর ভিত্তি করেই। অতএব, সাংবাদিকরা পাঠক-পাঠিকার চাহিদা অনুসারে খোরাক যোগাতে বাধ্য। পরিশেষে, আমাদের একান্ত কামনা, পত্রিকার পাতায় আমরা শুভ্র-সুন্দর জীবনের অকপট প্রতিফলন ও আশ্রয় প্রত্যক্ষ করব, অশ্লীলতা নয়।

(দৈনিক কর্ণফুলী, ৯ জুন, ১৯৯৮)

মৌলবাদী কারা?

আজকাল কোন পত্রিকা কিংবা সাময়িকী খুললেই মৌলবাদ, মৌলবাদী ইত্যাদি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে একটি চিহ্নিত মহল বেশ কয়েক বছর ধরে এ শব্দগুলো ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে গালি হিসেবেই ব্যবহার করে আসছেন। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বলতে গেলে সারা পৃথিবীজুড়ে এ শব্দগুলো এখন সতত ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। কোন মুসলমান স্বীয় জীবনদর্শন তথা ইসলামের আলোকে জীবন যাপন করতে গেলেই তাকে আজ মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনেকেই এ জাতীয় তথ্যসন্ত্রাসের কারণে বিভ্রান্ত হয়ে নিজের অজান্তেই ইসলাম-বিমুখ হয়ে উঠছেন। তাই, এই মৌলবাদ বা মৌলবাদী শব্দগুলোর ইতিবৃত্ত ও তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করা আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। আর তা করতে গেলে ইতিহাসের পাতায় ভর করে অনেক পেছেনে চলে যেতে হবে আমাদের। আসলে নিরপেক্ষ ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মৌলবাদ (Fundamentalism) ও মৌলবাদী (Fundamentalist) শব্দদ্বয়ের জন্ম পাশ্চাত্য সভ্যতার জঠরেই এবং খ্রিষ্টধর্মের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। ইউরোপের বুকে খ্রিষ্টান যাজকরা বহু বছর ধরে সাধারণ জনগণকে শোষণ এবং অত্যাচার জর্জরিত করেছিলেন ধর্মের নামেই। ফলে যাজক এবং যাজক প্রথার বিরুদ্ধে গণমানসে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। চূড়ান্ত পর্যায়ে যার বিস্ফোরণ ঘটলে অত্যাচারী যাজকদের আধিপত্য খর্ব হয় এবং তাদের মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইতিহাসের শিক্ষা অনুসারে যাজকদের ভাগ্যে সে জাতীয় গণধিক্কার ছিলো এক প্রকার অনিবার্য। স্বভাবতই এ ঘটনায় বিশ্ববিবেকে কোন প্রকার আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ওই শব্দগুলো যখন ধর্মপ্রাণ, সৎ, সহজ-সরল মুসলিমদের চরিত্র চিত্রণে ব্যবহৃত হয়, তখন অবাক এবং দুঃখিত না হয়ে পারা যায় না। অতীব দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে স্বীয় অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্যে যেসব মুসলিম সংগ্রাম করে চলেছেন, তাদেরকেই এখন মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এমনকি, কোন মুসলিম যদি তাঁর দৈনন্দিন ধর্মীয় কর্তব্যগুলোও সম্পন্ন করেন, তাহলেই তাঁকে মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কোন মুসলিম সাহিত্যিক ইসলামের শাশ্বত আদর্শের আলোকে সাহিত্য রচনা করেছেন তো আর কথাই নেই-এই শব্দ দুটো তাঁকে ঘায়েল করার চেষ্টা করবেই। অথচ শব্দ দুটোর উৎপত্তিগত চেতনা অনুসার সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্রই ছিলো প্রত্যাশিত। শব্দদ্বয়ের ব্যবহার ওদের জন্যেই করা উচিত ছিলো যারা যুগে যুগে ধর্মের নামে মানব জাতির শান্তি, ঐক্য ও প্রগতি নষ্ট করেছে-কলঙ্কিত করেছে পৃথিবীর ইতিহাসকে। ক্রুসেড নামের তিন তিনটি অযৌক্তিক, ভয়াবহ যুদ্ধের পরিণাম যারা মানবতার শিরে চাপিয়ে দিয়েছে তাদেরকেই মৌলবাদী

নামে চিহ্নিত করা উচিত ছিলো। তথাকথিত সাম্যবাদ বা কমিউনিজম কোন ধর্ম না হলেও প্রায় ধর্মীয় আবেগ-উৎসারিত প্রচন্ডতা ও উন্মাদনা নিয়ে ওই বস্তাপঁচা মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যারা লক্ষ জনতাকে হত্যা করেছে, তাদেরই নাম হওয়া উচিত ছিলো মৌলবাদী। হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী বাবরী মসজিদ ধ্বংস করতে গিয়ে যাঁদের একটুও বুক কাঁপে না, সেসব নরপশুর নামই মৌলবাদী হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু এ কী দেখছি আজ চতুর্দিকে? ক্রুসেডাররা মহান ধর্মযোদ্ধা, কমিউনজিমের ধ্বজাধারীরা মহান দার্শনিক, মানবতার বন্ধু এবং বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারীরা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক(?) রাষ্ট্রের শাসকের মর্যাদায় সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। কী বিচিত্র; কী বিস্ময়কর! অথচ এদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যম কিংবা আত্মবিক্রীত বুদ্ধিজীবীদের কোন বক্তব্য নেই। তাদের যত ক্ষোভ এবং মসিযুদ্ধ সব ইসলামের প্রকৃত, নিবেদিত অনুসারীদের বিরুদ্ধে। এর কারণ কী? কারণ খুবই সুস্পষ্ট। আসন্ন একবিংশ শতাব্দীতে যে ইসলামের বিজয় নিশান পতপত করে উড়বে আল্লাহর জমিনে, সে ব্যাপারে ইহুদী-নাসারাদের অর্থপুষ্ট পাশ্চাত্য গণমাধ্যম এবং বিকৃত মস্তিষ্ক বুদ্ধিজীবীরা পুরোপুরি সজাগ। তাই ইসলামের সম্ভাব্য সেই জাগরণ ঠেকাতে ওরা সবান্ধবে মাঠে অবতীর্ণ হয়ে নজিরবিহীন তথ্য সন্ত্রাস চালাচ্ছে। বন্ধুগণ, এ তথ্যসন্ত্রাস বা শয়তানী শক্তির অন্য কূটচালে বিভ্রান্ত হলে চলবে না। আমাদেরকেই ইসলামের বিজয় তরান্বিত করার জন্যে সর্বাত্বক প্রয়াস নিতে হবে। অতএব, প্রচলিত অর্থে মৌলবাদী হয়ে স্বীয় জীবন-দর্শনের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টায় আমাদের কোন প্রকার দ্বিধায় ভোগা কি উচিত? এ মুহূর্তে 'মৌলবাদ' এবং 'মৌলবাদী' শব্দ দুটো অলংকার হিসেবে গ্রহণ করা কি জরুরী নয়?

(দৈনিক কর্ণফুলী, ১৫ জুন, ১৯৯৮)

নকল প্রবণতা প্রসঙ্গে

পরীক্ষায় নকল প্রবণতা যে আমাদের জাতীয় জীবনে বিরাট এক অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে, তা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমাদের মনে হয় না। ব্যাপারটি কম-বেশি সকলেই উপলদ্ধি করছেন এবং মতামতও প্রকাশ করে চলেছেন বিভিন্নভাবে। সংবাদপত্রের পাতায়ও এ ব্যাপারে লেখালেখি নেহায়েত কম হয়নি। অধিকাংশ সচেতন নাগরিকের মতে, ছাত্র-ছাত্রীরাই নকল প্রবণতার জন্যে সবচে' বেশি দায়ী। কথাটা সত্য। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, শিক্ষার্থীরা কেন নকল প্রবণতায় আসক্ত হয়ে পড়ে? এই অশুভ প্রবণতার পেছনে কী কী কারণ দায়ী? আসলে এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে যা পত্রিকায় আলোচিত হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে। কিন্তু একটি ব্যাপার সবার না হলেও অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলেই মনে হয়। অশুভ এই প্রবণতার পেছনে কি সম্মানিত শিক্ষক সমাজের কোন ভূমিকাই নেই? সব দোষ কি শুধু শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে চাপানো উচিৎ? সত্যি কথা বলতে কি, নকল প্রবণতার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও অনেক সময় অত্যন্ত নেতিবাচক ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। পরীক্ষার কক্ষে তাঁরা নকল প্রবণতা রোধের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তো গ্রহণ করেনই না, বরং অতীব দুঃখের বিষয় যে, অনেক সময় শিক্ষার্থীদের নকল করতে সাহয্য করেন তাঁরা। কথাটি অবশ্য শহর এলাকার ক্ষেত্রে যতটুকু সত্য, তার চেয়ে বহুগুণে সত্য মফস্বলের স্কুল বা কলেজগুলোর ক্ষেত্রে। মফস্বলের অধিকাংশ স্কুলে এবং কলেজে নিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না সারাটি বছর। ফলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করতে এক প্রকার বাধ্যই হয় এবং এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দও সব কিছু দেখেও না দেখার ভান করেন। তাছাড়া শিক্ষক সমাজের উপর শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে হিংস্রতা ও সহিংসতার ভয়ও

উড়িয়ে দেবার মতো নয়। রাজনীতির কালো হাতের থাবাও অনেক সময় শিক্ষক সমাজকে শায়েস্তা করতে পিছ পা হয় না। এ সমস্ত কারণ তো আছেই, তার উপর অন্যান্য অনেক কারণে আজ ছাত্রসমাজে লেখাপড়ার প্রতি কাংখিত ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ফলে বাড়ছে জনশক্তির অপচয়য়, বেকারত্ব এবং নানা রকম সামাজিক বিকৃতি। কিন্তু এ অবস্থা তো আর অব্যাহত থাকতে পারে না। এর প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। জাতিকে মুক্ত করতে হবে এ বিধ্বংসী প্রবণতার কবল থেকে। সমস্যাটির গভীরে পৌঁছে বের করে আনতে হবে আশু এবং সঠিক সমাধানের জন্যে একটি বাস্তব ও কার্যকর পরিকল্পনা। নিশ্চিত করতে হবে সে পরিকল্পনার আন্তরিক বাস্তবায়ন।

(দৈনিক কর্ণফুলী, ৫ জুলাই, ১৯৯৮)

ধূমপান ও আমরা

সমগ্র বিশ্বে বর্তমানে যেসব মারাত্মক স্বাস্থ্যগত ও পারিবেশিক সমস্যা বিদ্যমান, তার মধ্যে ধূমপান অন্যতম। ধূমপানের অপকারিতা আমাদের সবার কাছে প্রতিদিনের সকালের সূর্যের আলোর ন্যায় স্পষ্ট। কিন্তু তবুও আমরা ধূমপান থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারছি না। আর এ না পারার পেছনে বহু কারণ সক্রিয় রয়েছে। তবে, আমাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবই এসব কারণগুলোর মধ্যে সবচে' ভয়াবহ কারণ হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। কেননা, চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবে কৈশোরের ধূমপান না করার মানসিক প্রতিজ্ঞা ও ধূমপানের প্রতি আবশ্যিক ঘৃণা আমরা বিস্মৃত হতে পারি অবলীলায়। অবশ্য, এ ব্যাপারে আমাদের অভিভাবকরাও কম যান না। তাঁরা একদিকে যেমন কিশোর এবং তরুণদের ধূমপান না করার জন্যে নসিহত করে চলেছেন অবিরত, ঠিক তেমনি ঐ সব কিশোর এবং তরুণের সামনেই ধূমপান করে স্ববিরোধীতায় লিপ্ত হচ্ছেন। একই কথা প্রযোজ্য আমাদের হাঁতুড়ে কিংবা রীতিমতো –পাশ করা ডাক্তারদের ক্ষেত্রেও। চেম্বারে গলদঘর্ম তাঁরা ধূমপানের স্বাস্থ্যগত অপকারিতা ও ধূমপান বর্জনের অনুরোধ জ্ঞাপনে। কিন্তু চেম্বার থেকে রোগী বেরুতে না বেরুতেই হয়তো তাঁদের দিয়াশলাই'র কাঠিতে আগুণ জ্বলে উঠছে ফস্ করে। ফলে এই 'ডাবল স্ট্যান্ড' এর কারণে তাঁদের নসিহত তেমন কাজে আসছে না। গ্রাম্য কিশোর কিংবা শহুরে তরুণ তেমন একটা মাথা ঘামাচ্ছে না তাঁদের মহামূল্য উপদেশ নিয়ে। তাই, ধূমপানের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে চাই ইস্পাত-কঠিন চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং স্ববিরোধীতা ও দ্বৈতাচরণ থেকে নিষ্কৃতি।

(দৈনিক কর্ণফুলী, ২৩ জুলাই, ১৯৯৮)

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রসঙ্গে

কয়েক মাস পূর্বে বর্তমান সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, দেশের সবক'টি জেলার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করা হবে। একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ যেহেতু বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি, সেহেতু এ ধরণের সিদ্ধান্ত নেয়ায় দেশের আপামর জনসাধারণ নিঃসন্দেহে আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, জনগণের সে আনন্দ স্থায়ী হয়নি। কারণ, প্রস্তাবিত ওই প্রকল্পের জন্য প্রতিটি জেলায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার, এলাকার বুদ্ধিজীবী,

ঐতিহাসিক, লেখক ও সাংবাদিকদের সমন্বয়ে একটি করে কমিটি গঠনের কথা ছিলো যা এখনও হয়নি। হয়নি বলেই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি। ফলে এ রকম অভূতপূর্ব, চমৎকার, ও যুগোপযোগী একটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হয়ে বরং মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের আজ যখন চরম বিকৃতি লক্ষ্যণীয়, তখন এ ধরণের সিদ্ধান্তের আন্তরিক বাস্তবায়ন সবারই একান্ত কাম্য। অথচ অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এ রকম কোন সিদ্ধান্ত যে বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছিলেন, তা খোদ সরকারই ভুলে বসে আছেন। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আকূল আবেদন, ওই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করে জাতির সেবায় নতুন মাত্রা যুক্ত করুন।

(দৈনিক পূর্বকোণ, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮)

উখিয়ার ঘাট-তুমব্রু সড়কে টেক্সীর উপদ্রব বন্ধ করুন

বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি থানার তুমব্রু ও ঘুমধুম দুটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। প্রায় সোয়া লক্ষ বনি আদমের বসতি এখানে। জীবনের চাকা সচল রাখতে গিয়ে কতো রকম পেশা যে এখানকার মানুষগুলো অবলম্বন করছেন, তার কোন হিসেব নেই। তবে এলাকার প্রায় শ'খানেক লোক উখিয়ার ঘাট-তুমব্রু সড়কে রিক্শা চালিয়ে অনেক কষ্টে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতে চেয়েছিলেন। অনেকদিন ধরে নির্বাহ করছেনও। কিন্তু জীবনে কষ্টার্জিত এই ন্যূনতম আর্থিক স্বস্তিও তাঁদের সয়নি। কিছুদিন আগে উক্ত সড়কে হঠাৎ করেই দশটি বেবি টেক্সী চলাচল করতে শুরু করে। ফলে রিক্শা চালকদের জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। তাঁদের বাধ্য হয়েই রিক্শা চালানো বন্ধ করে দিতে হয়। কারণ, টেক্সীতে যাতায়াতের সুযোগ পেয়ে যাত্রীরা রিক্সায় চড়া ছেড়ে দেন। ফলশ্রুতিতে উক্ত রিক্শা চালকরা হয়েছেন বেকারত্বের নির্মম শিকার এবং তাঁদের পরিবারগুলোর জীবন ধারণ হয়ে পড়েছে এক প্রকার অনিশ্চিত। জীবন ধারণের তাগিদে অনেক রিক্শা চালক ইতোমধ্যেই চুরি, ডাকাতিসহ বিভিন্ন প্রকার অসামাজিক কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। বলাবাহুল্য যে, এ ব্যাপারে রিক্শা চালকরা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ করেও কোন সুফল পাননি। আমরা জানি, কাঁচা রাস্তায় ভারী কোন যানবাহনের চলাচল দেশীয় অর্থনীতির জন্যে মারাত্মক এবং আইনতঃ নিরুৎসাহিত। আবার, বেবি টেক্সীর জন্যে পাকা সড়কই উপযুক্ত, যেক্ষেত্রে গ্রামীণ রিক্শা চালকদের একমাত্র ভরসা কাঁচা রাস্তা। তাছাড়া, এ ব্যাপারে গ্রামের বেকার রিক্শা চালক ও সচেতন গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। যা যে কোন সময় বিস্ফোরিত হয়ে অনেক কিছুই উল্টে-পাল্টে দিতে পারে। সর্বোপরি, বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও ভেবে দেখতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের করজোড়ে নিবেদন-অবিলম্বে উক্ত সড়কে রিক্শা চলাচল পুনরায় আরম্ভ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে শ'খানেক পরিবারের প্রায় সহস্র আদম সন্তানের জীবন ধারণ নিশ্চিত করুন।

(দৈনিক কর্ণফুলী, ০৬ অক্টোবর, ১৯৯৮)

উখিয়া ডিগ্রী কলেজে বিএসসি কোর্স চালু করা হোক

কক্সবাজার জেলার উখিয়া থানার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ উখিয়া ডিগ্রী কলেজ। ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এ কলেজটি এলাকায় উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিশেষ

করে নারী শিক্ষার প্রসারে এ কলেজের ভূমিকা অনন্য। বর্তমানে প্রায় দু'হাজার ছাত্র-ছাত্রী এ কলেজে অধ্যয়নরত রয়েছে। কলেজটিতে আইএ, আইকম ও আইএসসি এবং ডিগ্রী পর্যায়ে বিএ ও বিকম কোর্সগুলো চালু রয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তা নিরন্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অথচ দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, এ কলেজে বিএসসি কোর্স চালু না থাকায় আগ্রহ থাকা স্বত্বেও প্রচুর সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এ কলেজের একাডেমিক রেকর্ডও খুব ভালো। বিগত এইচএসসি পরীক্ষায় এ কলেজের একজন ছাত্রী চট্টগ্রাম বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় নবম স্থান অধিকার করেছে। তাছাড়া, বিএসসি কোর্স প্রবর্তনের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ শিক্ষকও এ কলেজে রয়েছেন। তাই, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের ঐকান্তিক আবেদন-অবিলম্বে উখিয়া ডিগ্রী কলেজে বিএসসি কোর্স প্রবর্তন করে অগণিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ করুন।

(**দৈনিক আজকের কাগজ, ২২ ডিসেম্বর**, **১৯৯৮**)

কেন এই ষড়যন্ত্র?

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। তবে নৈতিকতা-বর্জিত **শিক্ষা** অর্জনের ফলে প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিতদের দ্বারা জাতির মেরুদন্ড শক্ত হবার পরিবর্তে যে দিন দিন ভঙ্গুর ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে উঠছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এ সত্যই উপলব্ধি করে বিগত ১৯৯৪ সালে বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণ একত্রিত হয়ে মিশকাতুন্নবী দাখিল মাদ্রাসাটি গড়ে তুলেন।

তারপর থেকে এ অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রায় ৩০০ জন ছাত্র/ছাত্রী বর্তমানে এ মাদ্রাসায় পাঠরত রয়েছে। শিক্ষকতার গুরু দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন এলাকার ১০ জন উচ্চ শিক্ষিত তরুণ। শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় এবং জাতীয় দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে সমগ্র এলাকায় উল্লেখযোগ্য সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, সম্প্রতি এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটির পেছনে এক শ্রেণির স্বার্থবাদী মানুষ উঠেপড়ে লেগেছে।

তারা সরকারী বিভিন্ন এজেন্সির নিকট অন্য নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে এ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে দরখাস্ত পেশ করছে। তাদের একটাই উদ্দেশ্য, এই আলোর মশালবাহী প্রতিষ্ঠানটিকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়া। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র কখনোই সফল হবে না, ইনশাল্লাহ। সংশ্লিষ্ট সরকারী এজেন্সীগুলোসহ সমগ্র জাতির নিকট আমাদের আকূল আবেদন-নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্য আবিষ্কার করুন এবং এলাকার মানুষের প্রাণপ্রিয় এ প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে আসুন।

(**দৈনিক কর্ণফুলী, ২৯ ডিসেম্বর**, **২০০০**)

উপ-বৃত্তির নামে সীমাহীন দুর্নীতি বন্ধ করুন

আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের জন্যে বিনামূল্যে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করার ফলে সারাদেশে নারী শিক্ষার লক্ষ্যণীয় প্রসার ঘটছে। বিশেষ করে, এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে মেয়েরা আজ উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথে আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে এগিয়ে যেতে পারছে। ইতোমধ্যেই তাই দেখা যাচ্ছে যে, অনেক স্কুলে বা মাদ্রাসায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। জাতীয় পর্যায়েও এ প্রবণতা উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় মেয়েরাই ছেলেদের চেয়ে মেধা তালিকায় বেশি স্থান পাচ্ছে। বিগত ক'বছর পূর্বে নারী শিক্ষা অধিকতর প্রসারিত এবং উৎসাহিত করার জন্যে এমপিওভূক্ত সকল স্কুল ও মাদ্রাসায় পাঠরত ছাত্রীদের জন্যে বিশেষ উপ-বৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এমনকি, উপ-বৃত্তি সঠিকভাবে বণ্টনের জন্যে উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত আলাদা কর্মর্কর্তার পদ সৃষ্টি করে নিয়োগও প্রদান করা হয়। উপ-বৃত্তি প্রবর্তনের ফলে নারী শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ক্ষেত্রে আরেকটি দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে বলা যায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, এহেন সুদূর প্রসারী একটি ইতিবাচক পদক্ষেপও আজ দুর্নীতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি। শহুরে প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই দুর্নীতি তুলনামূলকভাবে কম হলেও মফস্বল তথা গ্রাম পর্যায়ের স্কুল, মাদ্রাসাগুলোতে উপ-বৃত্তিকে কেন্দ্র করে দুর্নীতিবাজরা হোলিখেলায় লিপ্ত হচ্ছে। এই দুর্নীতির আবার রয়েছে বহু রকমফের। যেমন-অনেক প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী আছে হয়তো পঞ্চাশ জন, কিন্তু উপ-বৃত্তি পাচ্ছে একশ' জন ছাত্রী। স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রী-প্রতি প্রদেয় শতকরা অংশটির পরিমাণ বাড়ানোর জন্যেই এটি করে থাকেন বলে জানা যায়। উপ-বৃত্তি প্রদানের জন্যে নির্ধারিত দিনে গ্রাম থেকে অ-ছাত্রী মেয়েদের ছাত্রী সাজিয়ে এ উদ্দেশ্যে স্কুলে হাজির করা হয়। আবার অনেক স্কুলে ছাত্রীদের প্রাপ্য উপ-বৃত্তির টাকা থেকে এটা-ওটা বলে মাথাপিছু ৩০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০ টাকা পর্যন্ত প্রতিবারে রেখে দেয়া হয় বলে প্রচুর অভিযোগ পাওয়া যায়। উপ-বৃত্তির দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা, ব্যাংক কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি, এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রত্যক্ষ যোগসাজশে এসব দুর্নীতি সারা দেশব্যাপী ঘটে চলেছে। ফলে ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছে। সদ্য বিলুপ্ত 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীর মতো উপ-বৃত্তিও হয়তো একদিন বাতিল হয়ে যেতে পারে কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা এবং শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত দুর্নীতিবাজদের অবর্ণনীয় কারসাজিতে। তাই, অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট করজোড়ে আবেদন করছি।

(**দৈনিক আজকের কাগজ ১২ জানুয়ারি**, **২০০১**)

ভুলে ভরা মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা একটি ধারা। মাদ্রাসার কারিকুলাম এবং সিলেবাসে আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল মেলানোর মানসে ক্রমান্বয়ে অনেক পরিবর্তন সূচিত করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, দাখিল স্তরের জন্যে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকসমূহে সীমাহীন ভুল-ভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। ভুলের মারাত্মক এই ছড়াছড়ি খুব বেশি দেখা যায় ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির জন্যে নির্ধারিত গণিত বিষয়ের বইগুলোতে। এই বইগুলোতে প্রতিটি প্রশ্নমালার প্রায় ৬০% অংক ভুল পরিলক্ষিত হয়। এ ভুল দেখা যায় হয়তো প্রশ্নে অথবা উত্তরমালায়। আবার দেখা যায়, দাখিল স্তরের প্রতিটি ক্লাসের প্রতি বিষয়ে বোর্ড কর্তৃক একাধিক পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত রয়েছে। ইংরেজির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাছাড়া, অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলোও তথ্যগত কিংবা বিষয়গত মারাত্মক ভুলের

কবল থেকে মুক্ত নয়। ফলে, একদিকে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে, ঠিক তেমনি সাধারণ শিক্ষা বা অন্য ধারায় শিক্ষিতদের সঙ্গে বাস্তব জীবনে তীব্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। এ সমস্যার কারণে এসব বিষয়ে পাঠদানকারী শিক্ষকরাও যে মানসিক চাপের সম্মুখীন হন, তাও বিবেচনায় রাখা দরকার। তাই অবিলম্বে এসব পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন অথবা এগুলোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিমার্জন করা একান্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি একযোগে এগিয়ে আসার জন্যে আহবান জানাচ্ছি।

(**দৈনিক আজকের কাগজ, ১ ফেব্রুয়ারী**, ২০০১)

ভোটার গণনাকারীদের সম্মানি ভাতা আদায় করা হোক

আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ৮ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে ভোটার গণনা ও তালিকাভূক্তির কাজ শুরু করা হয়েছিলো। উক্ত গণনার কাজ শুরু হবার পর গত বছরেই সম্পন্ন হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, গত বছরই প্রথম বারের মতো সারা দেশে কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মাধ্যমে ভোটার গণনা ও তালিকাভূক্তির কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং তা বাস্তবায়িতও করা হয়। ফলে দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি স্কুল, মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক/শিক্ষিকারা পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে এই কাজটি সম্পন্ন করেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে সবচে' বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকারা। ভোটার গণনা এবং তালিকাভূক্ত করতে গিয়ে তাঁদের অনেককেই অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে এবং এমনকি, জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে হয়েছে। এ সমস্যা আরও বেশি প্রকট আকার ধারণ করে উপজাতীয় কতিপয় বাসিন্দার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত না হবার সিদ্ধান্তে। কিন্তু অবিশ্বাস্য এবং অতীব দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, তাঁদের জন্যে ঘোষিত সম্মানি ভাতা এখনও তাঁদের প্রদান করা হয়নি। এ ব্যাপারে আমরা কতিপয় দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক স্থানীয় উপজেলা নির্বাচন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমাদের জানানো হয় যে, সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত সম্মানি ভাতা প্রদানের জন্যে এখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বলেই তা গণনাকারীদের মধ্যে বণ্টন করা যাচ্ছে না। এদিকে জাতীয় নির্বাচন দোরগোড়ায় এসে পড়েছে এবং ৪র্থ আদমশুমারির মতো বিশাল জরিপের কাজও ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। আদমশুমারির কাজেও অত্র এলাকার অনেক শিক্ষককে সুপারভাইজারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। অবস্থাদৃষ্টে সতীর্থ অনেক শিক্ষকই মনে করছেন, উক্ত ভোটার গণনার সম্মানির অর্থ বোধ হয় আর পাওয়াই যাবে না। আর সম্প্রতি সমাপ্ত আদমশুমারির সম্মানি ভাতা নিয়েও তাই এখন থেকেই জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। জাতির বিবেকের কাছে আমাদের একটাই প্রশ্ন-অসহায়, চরম দরিদ্র এবং ছাপোষা শিক্ষকদের জন্যে নির্ধারিত যৎসামান্য সম্মানির অর্থ প্রদানে এতো অবহেলা এবং অনীহা কেনো? তাঁদের প্রাপ্য অর্থ প্রদানের সময় কি এখনও হয়নি?

(**দৈনিক আজকের কাগজ, ১৭ ফেব্রুয়ারী**, ২০০১)

পার্বত্য জেলার সমস্যাঃ বান্দরবানে প্রশাসনিক অব্যবস্থা

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার ভেতর বান্দরবান অন্যতম। এ জেলাটি সার্বিকভাবে দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় তো বটেই, অন্য দুটো পার্বত্য জেলা থেকেও পিছিয়ে আছে। মূর্তিমান এই অনগ্রসরতার পেছনে দৃশ্যত অনেক কারণই দায়ী। তবে সবচেয়ে বিপদজনক কারণটি হলো প্রশাসনিক অব্যবস্থা। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রায় ৭০টিতেই প্রধান শিক্ষকের পদ বহু বছর ধরে শূন্য। এই শূন্য পদগুলোতে নিয়োগের জন্যে বিগত ১৯৯৯ সালে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিলো। দীর্ঘ দুই বছর পরে সম্প্রতি এই নিয়োগের জন্যে ইন্টার্ভিউ নেয়া হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করা হবে কবে অথবা আদৌ দেয়া হবে কিনা তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। একই অবস্থা ঘটেছে জেলাব্যাপী বিদ্যালয়গুলোতে বিরাজমান প্রায় ১৫০টি শিক্ষক/শিক্ষিকার শূন্য পদ নিয়ে। এসব পদে নিয়োগের জন্যে ইন্টার্ভিউ নেয়া হয়েছে ১৯৯৯ সালে। কিন্তু নিয়োগ প্রদানের কোন নামগন্ধও নেই। ফলে এ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে গেলে ভেঙ্গে পড়েছে। জেলার অন্যান্য খাতেও প্রায় একই রকমের দুরবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষা বিভাগসহ মোট ১৪টি বিভাগের পক্ষ থেকে প্রায় ৩০০টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্যে দরখাস্ত চেয়ে একযোগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিলো। আজ অবধি ওসব পদে ইন্টার্ভিউ পর্যন্ত নেয় হয়নি। ফলে যা হবার, তা-ই হচ্ছে। প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া এবং তা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে পদে পদে বেগ পেতে হচ্ছে। জনগণই এর মাশুল দিয়ে যাচ্ছেন; ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। চাকরি প্রার্থীরাও হচ্ছেন ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই দূরবস্থা এবং বিশৃঙ্খলার কারণ যা-ই হোক, সরকারের উচিত হবে নিয়মমাফিক যথাশিগগির সম্ভব, উক্ত শূন্য পদগুলোতে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দিয়ে প্রশাসনিক কাঠামোতে স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করা। এ জেলার বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ আশা করছি।

(**দৈনিক আজকের কাগজ, ২৮ ফেব্রুয়ারি**, **২০০১**)

শিক্ষক নিয়োগে ৩য় বিভাগ বা শ্রেণি কি মেধার মাপকাঠি?

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের তীব্র আন্দোলনের মুখে বর্তমান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তথাকথিত শিক্ষক নেতাদের গত বছরের ২৪ আগস্টে যে বিধ্বংসী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিলো, তা ব্যাপক আলোচিত একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ওই চুক্তির ন'টি শর্তের মধ্যে নয় নম্বর শর্তটি অর্থাৎ তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি সংক্রান্ত শর্তটিই ছিলো জঘন্যতম। ওসব শিক্ষক হঠাৎ করেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হয়ে চাকরি হারান এবং হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু সুখের বিষয়, শেষ পর্যন্ত শিক্ষক সম্প্রদায়ের টনক নড়ে। তাঁরা অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সম্প্রতি আন্দোলনে নেমে পড়েন। আর তারই ফলশ্রুতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শর্তটির আংশিক পরিবর্তন সাধন করে বিগত ১৪ আগস্টের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত ৩য় বিভাগধারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের এমপিওভূক্ত

করার জন্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ব্যাপারে সার্কুলারও জারি করা হয়েছে। হতাশাগ্রস্থ ওসব শিক্ষক/শিক্ষিকারা বেঁচে থাকার ন্যূনতম অবলম্বনটুকু আবার ফিরে পেয়েছেন। এজন্যে শিক্ষক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্নও না করে পারছি না। শুধু ২৪ আগস্টের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভূক্ত করাই কি যথেষ্ট? অথবা যৌক্তিক? ওই শর্তটি সম্পূর্ণ বাতিল করাই কি উচিত ছিলো না? বিভাগ/শ্রেণিই যে মেধার একমাত্র মাপকাঠি বা পরিচায়ক নয়, তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চোখে আঙ্গুল দিয়ে আরও কতোদিন, কতোভাবে দেখিয়ে দিতে হবে? নকল প্লাবিত এদেশে পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে মেধা যাচাই করা কি আদৌ সম্ভব? প্রাপ্ত বভাগ/শ্রেণির উপর নয়, বরং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় মেধা যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি আমাদের ঐকান্তিক আবেদন- যথাশিগগির সম্ভব, ওই অপরিণামদর্শী শর্তটি বাতিল করে প্রকৃত মেধাবী জনগোষ্ঠীর জন্যে শিক্ষকতার মতো একটি মহৎ পেশা অবলম্বনে বাধা অপসারণ করে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে এগিয়ে আসুন।

(**দৈনিক আজকের কাগজ, ৪ মার্চ**, **২০০১**)